ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

নজরুলের প্রবন্ধে বিষয়বৈচিত্র্য: প্রসঙ্গ *রুদ্রমঙ্গল*

ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম*

সারসংক্ষেপ: বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে অনন্য সাধারণ প্রাবন্ধিক নজরুল ইসলাম। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ও ত্রাসনের যাঁতাকলে যখন মানুষ পিষ্ঠ তখন প্রাবন্ধিক সাম্যের গান গেয়ে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক আবেদনগুলোকে যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক নবচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জাগরণের বাণী উচ্চারণের প্রয়াস গ্রহণ করেন। যার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয় *রুদ্রমঙ্গল* নামক প্রবন্ধ গ্রন্থটির প্রবন্ধগুলোর মধ্যদিয়ে। ভারতবর্ষে যখন মানুষ পরাধীনতায় তমসাচ্ছন্ন, নিপীড়িত মানুষের গোমরানো কান্না যখন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তখনই নজরুল তেত্রিশ কোটি মানুষের মুক্তির কামনায় জাগরিত হয়ে উঠেছেন। রক্ত-মাংসের পিপাসু হায়েনারা যখন মানুষের নাকে দড়ি লাগিয়ে ভারতবাসীকে মোড়াতে চায় তখন প্রাবন্ধিক তাঁর *রুদ্রমঙ্গলের* রুদ্রকে জাগরিত করতে চেয়েছেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যে নবচেতনা ও নবজাগরণের বাণী উচ্চারণ করেছেন, সেটিই তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে অনন্য সাধারণ জীবনভাষ্যে রূপ পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান ও যুগস্রষ্টা সু-সাহিত্যিক হিসেবে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে নবচেতনা ও নবজাগরণের বাণী তিনি উচ্চারণ করেছেন, সেটিই তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে অনন্য সাধারণ আবেদনে রূপ পেয়েছে। আর সে রূপের প্রকাশ ঘটেছে *রুদ্র-মঙ্গল* নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের আটটি প্রবন্ধের বক্তব্যের মাধ্যমে। এ বিষয়ে গবেষক ও প্রাবন্ধিক আজহার ইসলাম বলেছেন—'*রুদ্রমঙ্গল* গ্রন্থে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় আছে। কবি বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে ব্যক্ত করেছেন জাতীয় জাগরণের বাণী।'[১] নজরুলকে তাই বলা হয়ে থাকে শক্তি ও মুক্তির উত্থানে যুগ যন্ত্রণার বেদনায় মুখরিত একজন প্রতিবাদী মানুষ। শোষণ-পীড়নে জর্জরিত জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে শান্তির আভাস স্থাপনে তিনি ছিলেন বদ্ধ পরিকর একজন মানুষ। শাসন-শোষণ, ত্রাসন ও সমাজে বিরাজমান অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষ যখন বিপন্ন, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য যখন অশনিসংকেত তখন দীপ্ত প্রত্যয়ে প্রাবন্ধিক জাগরণের গান গেয়েছেন। ঘুমন্ত জাতি তথা ভারতবাসীকে জাগানোর জন্যই তিনি *রুদ্রমঙ্গল* নামক প্রবন্ধ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন।

ভারতবর্ষে মানুষ যখন পরাধীনতার নিগড়ে বন্দি, নিপীড়িত মানুষের গোমরানো কান্না যখন ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তখনই নজরুল তেত্রিশ কোটি মানুষের মুক্তির কামনায় জাগরিত হয়ে উঠেছেন। রক্ত-পিপাসু হায়েনারা যখন মানুষের নাকে দড়ি লাগিয়ে ভারতবাসীকে ঘোরাতে চায় তখন প্রাবন্ধিক তাঁর রুদ্রমঙ্গলের রুদ্রকে জাগরিত করতে চেয়েছেন। অবশ্য বলা চলে তাঁর লেখা প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর মতোই 'শান্ত ধীর ও প্রত্যয়নিষ্ঠ কণ্ঠ শোনা যায়।'[২]

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ

প্রাবন্ধিক তাঁর নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আঘাতের দেবতাকে আলোচ্য গ্রন্থে আহ্বান জানিয়েছেন। রুদ্র এসে যেন ভীরু ও চির মার খাওয়া ভারতবাসীর পাশে দাঁড়ায়। ঘুমন্ত ভারতবাসীর যেন ঘুম ভেঙ্গে যায়। যেন তারা জেগে ওঠে পরাধীন শৃঙ্খল ও নির্যাতনের নাগপাশকে ছিন্ন করতে পারে। ভারতবাসী আজ লাঞ্ছিত। মাতৃভূমির সর্বনাশা চিত্র দেখে কবির মধ্যে এক ধরনের রোষের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। ভারতবাসী যেন এমন মুহূর্তে অত্যাচারীর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা ছিন্নভিন্ন করতে পারে। তাই প্রাবন্ধিক শক্তির দেবতা ভয়ঙ্কর শিবের আগমন কামনা করেছেন। ঘুমন্ত ভারতবাসীকে নতুনভাবে গড়ে তুলবার আহ্বানই *রুদ্রমঙ্গল* নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের সারকথা।

প্রাবন্ধিক নজরুল ইসলাম *ধূমকেতু* পত্রিকায় যে সব জীবনমুখী সত্যবাণী অগ্নিঝরা ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছেন তার মধ্যে *আমার পথ* নামক প্রবন্ধটি অন্যতম। প্রবন্ধটি ধূমকেতুর পথ শিরোনামে *ধূমকেতু* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। *ধূমকেতু* পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠককে জানানোই হলো *আমার পথ* প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। অনুরূপ কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বিচিত্রপ্রবন্ধ* গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে— 'ভারতবাসীকে সর্বাগ্রে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। নিজের সঙ্গত দাবি ও অধিকার প্রাপ্তির জন্য রাজদরবারে বিনীত প্রার্থনা পদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন বা অনুমোদন করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল যে, ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জাতীয় মুক্তি, উন্নতি বা অগ্রগতি কখনোই সম্ভবপর নহে।'[৩] দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন, নানা ধরনের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল তখন দেশবাসীকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করা এবং মানুষের মনে মুক্তবুদ্ধি জাগিয়ে তোলার যে অবলম্বন সেটিই *আমার পথ* প্রবন্ধের সারকথা। প্রাবন্ধিক এ প্রবন্ধে সমস্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ, পীড়ন, দুঃশাসন ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে যখন মানবতা বিঘ্নিত হচ্ছে, সমাজ কাঠামোতে যখন মিশ্রিত হয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ ঠিক তখনই প্রাবন্ধিক সমাজ ও স্বজাতির জন্য সর্ববাদী মানুষকে মুক্তিকামী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। স্বাধীনচেতা এই মানুষটি তখন শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে গেয়েছেন জাগরণীর গান। ঘুমন্ত ভারতবাসীকে তখন জাগ্রত করার জন্যই তিনি কলম ধরেছেন। প্রবন্ধটি *ধূমকেতু* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে তখন স্বাধীনতার অগ্নিবাণীগুলো ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। *ধূমকেতু* পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জানানোর জন্যই পাঠকের উদ্দেশ্যে প্রাবন্ধিক তখন এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। সে সময় দেশে চলছিল অসহযোগ আন্দোলনসহ নানা ধরণের বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষোভ। সেই সাথে চলছিল রাজনৈতিক আন্দোলন। এমন পরিস্থিতিতে *ধূমকেতুর* লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে প্রকাশ পায় দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার বাসনা। মানুষের মনে তাই মুক্তবুদ্ধি জাগ্রত করার লক্ষ্যেই *আমার পথ* প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য সার্বিকভাবে বিকশিত হয়।[৪] *ধূমকেতুর* সম্পাদক হিসেবে প্রাবন্ধিক দেশের সার্বিক কল্যাণের মহৎ ও মানবিক উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন *আমার পথ* প্রবন্ধে। প্রাবন্ধিক যুগের চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রাবন্ধিক মনে করেন বহুদিন ধরে দেশমাতৃকার পরিবর্তে পরাধীনতা আমাদেরকে বন্দি করে রেখেছে। তাই এখান থেকেই স্বাধীনতার যাত্রা শুরু করতে হবে ধূমকেতুর রথে চড়ে। আর

সে যাত্রাই হলো *আমার পথ* প্রবন্ধটি। প্রাবন্ধিক নজরুল *আমার পথ* বলতে পথ প্রদর্শক সত্য পথের কথা বলেছেন। সত্য পথে চললে জাতি তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। সত্যের পথ ছাড়া আর অন্য কোনো পথের যাত্রী তিনি হতে চান না। সত্য পথে চলার পরিণতি অনিবার্যভাবেই সত্য হয়। রাজভয় ও লোকভয়কে কখনো ভয়ের কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন না। তিনি মনে করেন সত্যকে সত্যি হিসেবে চিনতে পারলে মনে আর কোনো ভয় থাকে না। এজন্য প্রাবন্ধিক বাইরের জগতের কোনো ভয়ে ভীত নন। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন সাহসী সৈনিক। সে কারণে ভয় তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারে নি। কবির বিশ্বাস যার অন্তরে মিথ্যা লালিত হয় সেই কেবল জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়। তাঁর আত্মশক্তি কখনো অকেজো হয়ে পড়ে না। ফলে কোনো কিছুই অপূর্ণ থাকে না।

প্রাবন্ধিকের মতে নিজেকে চেনাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই প্রথমে নিজকে চিনতে হবে। 'আত্মাকে চিনতে পারলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়।'[৫] নিজেকে চিনলেই সব কিছুকে চেনা যায়। এই সূত্রমতে মিথ্যাকে চিনে নিতে পারলেই আর মিথ্যাকে ভয় পাবার কোনো কিছু থাকে না। যার মনের উদ্দেশ্য অসৎ সেই কেবল মিথ্যাকে ভয় পায়। নিজকে চিনতে পারলে এতটাই আত্মশক্তি সঞ্চিত হয় যে মনে হয় যেন পৃথিবীর কোনো অশুভ শক্তি তাকে বাঁধা দিতে পারবে না। কেউ তাঁকে কোনো ভয় দেখিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না। তাই তিনি কোনো ভয়ে মাথা নত করেন না। তিনি 'আপন সত্য ছাড়া কাউকে কুর্নিশ করেন না।'[৬] আত্মনির্ভরতা যে দিন সত্যি সত্যিই আমাদের মধ্যে আসবে, সে দিনই আমরা স্বাধীন হব।

মানুষ নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারলে সত্যের জয়কে ছিনিয়ে নিতে পারে। পথ প্রদর্শক হিসেবে নিজেও এগিয়ে যেতে পারে। *আমারপথ* প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম সে কথাটিকেই ব্যক্ত করেছেন। মহাত্মা গান্ধী নিজেকে চেনার ফলে স্বাবলম্বী হবার কথা বলেছেন। কিন্তু ভারতবাসী ভুল করে স্বাবলম্বী হতে পারেন নি বরং তাঁর উপর অবলম্বন করে থাকার ফলে তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। এমন কৃতকর্মই হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় গোলামি বা দাসত্ব। অন্তরে যেহেতু আমাদের গোলামি আছে, সেহেতু আমাদের গোলামিপনা কখনো যাবে না। সেজন্যই নজরুল ইসলাম মনে করেন আত্মনির্ভরতার একমাত্র উপায় হলো আত্মাকে চেনা। আত্মনির্ভরতা ছাড়া আমাদের স্বাধীন হবার কোনো পথ নেই। সেদিন আমরা সত্যিকারের আত্মনির্ভরশীল হতে পারব, যেদিন আমরা আমাদের জীবনের মুক্তিকে অর্জন করতে পারব। নিজেকে নিষ্ক্রিয় রেখে অন্যকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে পরনির্ভরশীলতা এসে পড়বে। ফলে স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। প্রাবন্ধিক মনে করেন যে, এদেশের মানুষের মনে-প্রাণে এবং অন্তরে যে পচন ধরেছে তা একেবারেই ধ্বংস করে দিয়ে সেখান থেকে নতুন উপায় সৃষ্টি করতে হবে। যেখানে পচন ধরেছে সেটুকুকে ধ্বংস করে নতুন ইমারত গড়তে পারলেই তা হবে চিরস্থায়ী। পুরাতন, পঁচা ও নষ্টকে ধ্বংস করে দিলে সৃষ্টির পথ দেখাবে ধূমকেতু। 'দেশের যা কিছু মিথ্যা, মেকি, ভণ্ডামি

তা কেবল দূর করতে সক্ষম হবে *আমার পথ*।'[৭] আমরা দায়মুক্ত হতে পারলেই সম্পূর্ণভাবেই স্বাধীন হতে পারবো। তাই *ধূমকেতু* কারো কথাকে বেদবাক্য হিসেবে মেনে নেয় না। কেবল সত্য জ্ঞান করলেই তা মেনে নেবে। ধূমকেতুর দ্বীপশিখা কখনো নিভে যায় না। কেবল মিথ্যা স্পর্শ করলেই তা নিভে যায়। এছাড়া আর অন্য কোনো উপায়ে তা নিভবে না।

প্রাবন্ধিক একই সাথে ধূমকেতুকে মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অসাম্প্রদায়িকতার কারণেই ভারতের স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মূল কারণ খুঁজে তা দূর করা *ধূমকেতুর* একমাত্র উদ্দেশ্য। নজরুল ইসলাম মনে করেন সত্যে-সত্যে ও মানুষে-মানুষে মিলন ঘটলেই ধর্মের বৈষম্য, হিংসা, দুশমনি কোনো কাজ করতে পারবে না। যাঁরা সত্যে ও ধর্মে বিশ্বাস করে তারাই শুধুমাত্র ধর্মকে চিনতে পারে। 'যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মকে সত্য চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।'[৮] তাই দেশের জন্য যা সত্য ও কল্যাণকর তাকে সামনে রেখেই প্রাবন্ধিক পথে বের হয়েছেন। আর সে পথ হলো সত্যের ও স্বাধীনতা অর্জনের। যে ব্যক্তি এ পথের সন্ধান পান নি তারাই কেবল বিরোধ ও হাঙ্গামায় ব্যস্ত থাকেন। আত্মশক্তির দৃঢ় বিশ্বাস প্রাবন্ধিককে খ্যাতির পথে অধিষ্ঠিত করেছে। *আমার পথ* প্রবন্ধটি তারই সাক্ষী হয়ে আছে। প্রবন্ধটি রচনা করে প্রাবন্ধিক তাঁর ব্যক্তি মানসে চরম স্থিতি খুঁজে পেয়েছেন। তাই তিনি আপন জাতির মধ্যে আপন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি কেবল বিদ্রোহের অমিয় বাণী নিয়েই আবির্ভূত হন নি, যুগের প্রয়োজন এবং জাতির সমস্যাকে সহানুভূতির সাথে আপন চেতনায় স্থান দিয়েছেন। বিশ্বাসের এমন নির্মাণ শৈলীর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো *আমার পথ* প্রবন্ধটি।

নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের শুরু থেকেই জাতিকে জাগরণের গান শুনিয়েছেন। আর এরই বহিঃপ্রকাশ *মোহর্‌রম* প্রবন্ধে বিশেষায়িত হয়েছে। প্রাবন্ধিক বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের সমাজজীবনের দৈন্যদশাকে ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে মুসলমানদের ত্যাগের ঐতিহ্য তুলে ধরে জাতীয় জাগরণের অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। মোহররমের আত্মবিসর্জনের কাহিনির সাথে বর্তমানকালের ভণ্ডামির চিত্র তুলে ধরে তিনি ইসলামের মূল্যবোধ থেকেই ত্যাগ ও সত্যকে উপলব্ধি করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। 'তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে ও উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গলা ধরাধরি করে এসেছে। কোরবানী, মহররম, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা সবই হলো তাঁর কবিতার বিষয়।'[৯] সেইসাথে তিনি ধর্মের মহিমান্বিত জীবন অনুসন্ধানের আহ্বানও জানিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের শোষণমুখী আচরণের বিরুদ্ধে তিনি যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। ধর্মীয় গোড়ামি, ভণ্ডামি ও ধর্মের বেশধারী প্রতারকদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় আক্রমণ চালিয়েছেন। ভারতবর্ষের শান্তিকামী জাতিকে ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে দিয়ে জাতীয় জীবনে জাগরণের জোয়ার আনতে চেয়েছেন। বাঙালি মুসলমানদের জাগ্রত করার জন্য

তিনি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বরেণ্য ব্যক্তি হবারও আহ্বান জানিয়েছেন এই প্রবন্ধের আবেদনে। ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে সহজে গ্রহণ করে মহান এবং উদার হবারও আহ্বান জানিয়েছেন। সংস্কারাচ্ছন্ন ও দৈন্যময় জীবন পরিত্যাগ করে অশ্রুর ভণ্ডামিকে রোধ করতে বলেছেন। হায় হোসেন, হায় হোসেন করে যাঁরা কারবালার এই দিনটিতে ভণ্ড সাধকের মতো কান্নাকাটি করে নজরুল তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। ভণ্ড তপস্বীর সাধনাকে তিনি ব্যঙ্গের মাধ্যমে শাণিত করেছেন। ১০ মোহর্‌রম ইসলামের আদর্শে প্রাণত্যাগকারী শহীদ দিবসকে আজ তারা উৎসবে পরিণত করেছে। অশ্রুর নামে ভণ্ডামি, কান্নার নামে কৃত্রিম কর্কশ চিৎকার করে মা ফাতেমার পুত্রদের আত্মাকে পীড়িত করে তুলেছে। শোকাতুর আত্মাকে তারা পীড়িত করেই কেবল ক্ষান্ত নয়, বরং স্বয়ং স্রষ্টার সাথে এরা প্রতারণা করে নবী করিম (সা.) এর বুকে আঘাত দিয়ে চলেছেন। সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য যাঁরা জীবন কোরবানি করেছিলেন, আজ সেসব শহিদ বীরদের নামে কান্নার অভিনয় করে তাঁদের আত্মাকে অপমানিত করছেন। যারা অনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সাথে ধর্মকে মিশ্রিত করে পবিত্র কারবালাকে অবমাননা করছেন প্রাবন্ধিক তাদেরকে কটাক্ষ করে আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রাবন্ধিক নজরুল ইসলামের মতে, যাঁদের অতীত ছিল গৌরবের ও বীরত্বের তাঁরা আজ পদদলিত হয়েছে গোলামির কারণে। 'যে শির আল্লার আরশ ছাড়া কোথাও নত হয় না, সেই শিরকে জোর করে সেজ্‌দা করাচ্ছে অত্যাচারী শক্তি,— আর তুমি করছ আজ সেই শহীদদের—ধর্মের জন্য স্বাধীনতার জন্য শহীদের—মাতমের অভিনয়! আফ্‌সোস মুসলিম! আফ্‌সোস!!'[১০] সুতরাং কারবালার শোকের দিনে অভিনয়ের পরিবর্তে শোককে শক্তিতে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছেন। সেইসাথে আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামকে অক্ষত দেহে এবং উন্নত শিরে গড়ে তোলার জন্য। প্রাবন্ধিকের আহ্বান ছিল কেবল শির উন্নত করার আহ্বান। তাই তিনি কারবালার বিষাদময় দিনে কুসংস্কারকে চরম ঘৃণার সাথে দেখেছেন। আর আহ্বান জানিয়েছেন অপবিত্রতাকে দূর করে পবিত্র হবার। এ মহান দিবসে বিশ্বের মুসলমানদের বুকে অবিশ্রান্ত ক্রন্দন গুমরে উঠার তৃষ্ণাকে তিনি শ্রদ্ধার সাথে সম্মান জানিয়েছেন। মুসলমানদের বুক আজ সাহারার মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। মুসলিম সমাজ আজ অপরিসীম তৃষ্ণায় কেঁদে চলছেন। পুত্রহারা মা ফাতেমার আকুল ক্রন্দনে খোদার আরশ কেঁপে ওঠে।[১১] মুসলমানদের কর্তব্য যেন অভিনয়ের কান্নায় নিমজ্জিত না হয়। ইসলামের স্বাধীনতাকে এজিদ যেভাবে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত করেছে, ঠিক তেমনিভাবেই শির উঁচু করে ইসলামের শিরকে উন্নত করতে হবে। সত্যকে রক্ষা করতে পারলে মা ফাতেমার কান্না থেমে যাবে। সেইসাথে বন্ধ হবে আল্লার আরশের কম্পন। কাশেমের তৃষ্ণার্ত ও অতৃপ্ত আত্মা শান্ত হবে ইসলামের স্বাধীনতা রক্ষায়। তরুণের তাজা রক্তে ও জীবন বলিদানে ইসলাম আজ বিশ্বের দরবারে সমাসীন হয়েছে। বিধবা সখিনার কান্না থামাতে পারে কেবল মুসলিম তরুণরা। কাশেমের মতো ইসলামের জন্য জীবন ত্যাগের মাধ্যমে আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তাহলেই মোহর্‌রমের পবিত্রতা আজ আমরা রক্ষা

করতে পারবো। সুতরাং মোহর্‌রমের শিক্ষা মাতম নয়, বরং মা ফাতেমা ও হযরত আলী (রা.) কান্না স্মরণ করে তাঁদের ত্যাগের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হতে হবে। এ বিষয়ে সাহিত্য সমালোচক মোহাম্মদ আবদুল কাইউম বলেন— 'মহর্‌রমের অন্তর্নিহিত বেদনার ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।'[১২] ইসলামের উন্নত শিরে বিশ্বকে দাঁড় করাতে পারলেই মোহর্‌রমের শিক্ষা অর্জিত হবে। অর্থাৎ আত্মত্যাগের শিক্ষাই হোক মোহর্‌রমের শিক্ষা। প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে সে শিক্ষা গ্রহণের জন্যই সার্বজনীন আহ্বান জানিয়েছেন।

মুসলমানদের কৃতকর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষার ত্যাগ তিতিক্ষা একটি বিশ্বনন্দিত বিষয়। মোহর্‌রমের মতো ঘটনায় ত্যাগের দৃষ্টান্ত এক বিরল বিষয়। ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত থাকার পরেও মুসলিম সমাজ আজ হতদরিদ্র, পরাধীন এবং পিছুটানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাঁরা তাঁদের ঐতিহ্য ও স্মৃতিকে আজ শাসকের দাসত্বে পরিণত করেছে। এজন্যই মোহর্‌রমের মেকি কান্না না কেঁদে, লোক দেখানো কান্নার অভিনয়কে উৎসবে পরিণত না করে মোহর্‌রমের ত্যাগ থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন। মোহর্‌রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম জাতিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দ্বিধাহীন আহ্বান জানানো হয়েছে প্রবন্ধটিতে। প্রাবন্ধিক দ্বিধাহীন চিত্তে মোহর্‌রমের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রবন্ধটির মাধ্যমে কারবালার মহিমাময় তাৎপর্যকে প্রকৃত অর্থেই তুলে ধরা হয়েছে। 'ঐ শোনো সদ্য স্বামীহারা বালিকা সকিনার মর্মভেদী ক্রন্দন, সে চায় না তার স্বামী কাসেমের প্রাণ, সে চায় ইমলামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে কাসেমের মত প্রাণ বলিদান।'[১৩] বিশ্বের মুসলমানদের ত্যাগ করার মতো ক্ষমতা, সাহস ও মানসিকতা তৈরির আহ্বানও তিনি জানিয়েছেন। ত্যাগের মধ্যদিয়েই জীবনের প্রত্যাশা আমাদের পূরণ করতে হবে। সে শিক্ষা আমরা পেয়েছি হাসান ও হোসেন নামক দু'জন মুসলিম মহামানবের জীবনাদর্শে।

প্রাবন্ধিক তাঁর *বিষবাণী* প্রবন্ধে নিজেকে বিদ্রোহী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। *রুদ্রমঙ্গল* গ্রন্থের অন্তর্গত *বিষবাণী* প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহী শিশুর একজন প্রতিনিধি হয়ে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। যারা দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত প্রাবন্ধিক তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য হলো— 'স্বরাজ টরাজ বুঝিনা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগরপার পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না।'[১৪] দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের প্রতি তিনি দ্রোহে উদ্বেলিত হয়ে বক্তব্যকে *বিষবাণী* হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ভারতবর্ষের তরুণদের তিনি অগ্নিরূপ

ধারণকারী নাগ-নাগিনীর আখ্যা দিয়ে অভয়দান করেছেন। তরুণদের তিনি বিষ সঞ্চয় করতে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রবন্ধে সে জাতীয় বিদ্রোহই প্রকাশিত হয়েছে। প্রাবন্ধিক নজরুলের মতে, তরুণদের সমস্ত শরীরে আছে বিষের ভাণ্ডার। আর এই বিষ হলো অধরা। তাই তরুণদের কেউ কোনো দিন ধরতে পারবে না। তরুণদের ধরতে এলেই বিষের দহনে তাঁদের হাড়-মাংস এক হয়ে যাবে। জগতের এমন কোনো কারাগার নেই, যে কারাগারে নাগরূপী তরুণদের কেউ আটকে রাখতে পারে। তরুণদের বিষের দহনে কারাগারের লৌহগুলো গলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তরুণদের তিনি এভাবেই শক্তি সঞ্চয়ের পরামর্শ দিয়েছেন *বিষবাণী* প্রবন্ধে। পৃথিবীর জাগতিক অন্যায়-অবিচার দূর করতে পারে কেবল তরুণ সমাজ। তাই তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখার কোনো সুযোগ নেই। তরুণদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে আগুন এবং তাদের ক্রিয়া-কর্মেও উদ্‌গীরণ হয় আগুন। তাই তরুণদের নিঃশ্বাসের বহ্নিশিখায় কারাগার জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এমন নাগরূপী তরুণদের শুধু জেলখানার জল্লাদ নয়, পৃথিবীর কোনো জল্লাদই তাদের হত্যা করতে সাহস পায় না। কারণ জল্লাদেরা জানে এসব তরুণদের মধ্যে যে বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত আছে সেটিকে রোধ করা সহজ ব্যাপার নয়। তাঁদের বহ্নিশিখা দ্বারা ফাঁসির রশ্মি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এ জন্যই *বিষবাণী* প্রবন্ধে দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার আহ্বান তিনি জানিয়েছেন।

প্রাবন্ধিক নজরুল মনে করেন কেবল তারুণ্যের শক্তি পৃথিবীর অন্যায় অবিচারকে প্রতিহত করতে পারে। অন্যায়-অবিচার প্রতিহত করতে হলে করণীয় বিষয় হিসেবে তরুণদের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। তাই তিনি তরুণদের আরো শক্তি সঞ্চয়ের আহ্বান জানিয়েছেন। *বিষবাণী* প্রবন্ধে তরুণদের তিনি নাগশিশু বলে বিষ সঞ্চয়ের আহ্বান জানিয়েছেন। যে বিষ কেবল পার্থিব জীবনের সব অত্যাচারকে পুড়ে মারতে পারে; মরার পরেও যে বিষ সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকে।[১৫] সে বিষের আবেদন কখনো শেষ হয় না। তরুণদের এমন সঞ্চিত বিষই নির্ভয়ে পৃথিবীর সব মহলকে নিমিশেই নিঃশেষ করে দিতে পারে। সে কারণেই তিনি বিদ্রোহের প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর *বিষবাণী* প্রবন্ধের বিষয়চেতনার বক্তব্যের সারকথায়। তরুণরূপী নাগশিশুদের মরণের পরেও বিষক্রিয়া উজ্জীবিত থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে তেজদীপ্তভাবে সেই বিষ পৃথিবীতে থেকে যাবে। এ বিষ মিশে থাকবে বাংলার আকাশে-বাতাসে। যখনই প্রয়োজন পড়বে তখনই বিষক্রিয়ার দহনে জাগতিক অন্যায়-অবিচার দূর হয়ে যাবে। প্রাবন্ধিক নজরুল ইসলাম *বিষবাণী* প্রবন্ধে এভাবেই জ্বালাময়ী প্রত্যাশা-প্রাপ্তির কথা বলতে সক্ষম হয়েছেন। তরুণদের শরীরে হাজার হাজার বিষক্রিয়া হলাহলভাবে অভয়দানে যেন আখ্যা দিয়ে থাকে। তাদেরকে কেউ আবদ্ধ করতে এলে বিষক্রিয়ার আঘাতে দংশিত হয়ে যান। তেমনই একটি শক্তির সাহস সঞ্চয়ের প্রচারপত্র হলো *বিষবাণী* নামক প্রবন্ধটি।

তরুণরূপী নাগশিশুদের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নজরুল ইসলাম বুঝাতে চেয়েছেন যে, তরুণরা প্রেম, করুণা, প্রণয় ও প্রীতির উর্ধ্বে। প্রেম তাদের কাছে কেবল ভণ্ডামি, আর

করুণা হচ্ছে বিদ্রূপ, প্রণয় তাদের কশাঘাত, প্রীতি তাদের কাছে ভীরুতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিবাহ বন্ধনমুক্ত তরুণরা বিবাহের লালচেলি ও রক্তরাঙা উড়িয়ে দিতে সক্ষম। ফাঁসির রশি তাদের কাছে প্রিয়া বা প্রেমের বন্ধন। তারা মৃত্যুর শপথ পাঠ করে গৃহ ত্যাগ করে, তাদের প্রাণ রক্তঝরা, রণাঙ্গনকে তারা বুক পেতে দিয়ে আরাম সজ্জা হিসেবে মনে করেন। বেয়নেটের আঘাতে আঘাতে তাদের বুক ক্ষত-বিক্ষত হয়। আর স্কন্ধে থাকবে ঘাতকের ছুরির আঘাত। নজরুল ইসলাম এমন জ্বালাময়ী কথা বলে *বিষবাণী* প্রবন্ধে তরুণ বিদ্রোহের স্বরূপকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তরুণ নাগশিশুরা মূলত অবিনশ্বর। তাদের কোনো ক্ষয় নেই, তাদের একজনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে লক্ষজনের সৃষ্টি হয়। তরুণদের শরীরের একবিন্দু রক্ত যখন জমিনে পড়ে, তখন তাদের সেই বীজ লক্ষ বিদ্রোহী নাগশিশুর জন্ম দেয়। বিদ্রোহী নাগশিশুরা তখন জন্ম দেয় লক্ষ বিদ্রোহী নাগশিশুর। 'আমরা দেশ-শত্রু বিভীষণের মহাকালান্তক কাল। আমরা অকাট্য ব্রহ্মশাপ! পরীক্ষিতের মত, লখিন্দরের মত দুর্ভেদ্য ছিদ্রহীন দুর্গের মধ্যে থাকলেও দেশবিদ্রোহীকে আমরা রক্ষক হয়ে সূত্ররূপী কালসাপ হয়ে দংশন করি।'[১৬] তারা অদম্য, তাদেরকে কখনো দমিয়ে রাখা যায় না। তাদের একজনকে দমিয়ে রাখতে চাইলে লক্ষ নাগশিশু এসে তাদের স্থান দখল করে নেয়। দেশ মাতৃকার কাজে নিয়োজিত সেসব তরুণ বিদ্রোহীরা কোনো কিছুতেই ভয় পায় না। যাঁরা দেশদ্রোহী, মানুষের রক্ত শোষণকারী তাদেরকে বিন্যাস করাই হলো নাগশিশুদের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই যাঁরা দেশের জাগ্রত পাহারাদার, তারা দেশকাল সময়-সমাজে চুপ করে বসে থাকতে চায় না। তাঁরা দুর্ভেদ্য দুর্গও ছিনিয়ে আনতে চায়, তাদের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই।

বিষবাণী প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম নাগশিশুদের করাল দংশন থেকে বিদ্রোহীদের নিস্তার নেই মর্মে স্পষ্ট কথা জানিয়ে দিয়েছেন। নাগশিশুরা কালসাপ হয়ে দেশদ্রোহীদের নিধন করবেই। পৃথিবীর কোনো শক্তিই নাগশিশুদের দমিয়ে রাখাতে পারবে না। এরা কোনো প্রসাধনী সামগ্রীর মতো নয়। অতি মূল্য বা অতি খয়রাত করে তাঁদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় পরিকল্পনা কেবল দমন করতে পারে এই নাগশিশুরা। তাই নজরুল *বিষবাণী* প্রবন্ধে বিদ্রোহের বিষবাণীকে শাণিত করে কালসাপ রূপ ধারণ করে তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। কালসাপ যেমন সুযোগ পেলে দংশন করে, তেমনি এই নাগশিশুরা দেশদ্রোহীর শরীরে বিষক্রিয়া ছড়িয়ে দিতে সদা-সর্বদা প্রস্তুত। দেশদ্রোহী রবার্ট এমেটকে আইরিশ নাগশিশুর দল যেভাবে ফাঁসিতে হত্যা করে তিন টুকরো করেছিল। সেইসাথে তা তিন টুকরো করার পর রাস্তার মোড়ে লিখে রেখেছিল 'দেশদ্রোহীর পরিণতি দেখ'। অনুরূপভাবে আমাদের নাগশিশুরা দেশদ্রোহী বিভীষণদের তেমনভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। 'আমাদের বিদ্রোহ যারা দেশ জয় করেছে তাদের উপর নয়, আমাদের বিদ্রোহ দেশদ্রোহীদের উপর।'[১৭] দেশদ্রোহীদের হুঁশিয়ার করে নাগশিশুরা জানিয়ে দিয়েছেন যে, দেশদ্রোহীদের দেশসেবার অন্তরালে দেশদ্রোহীমূলক কর্মকাণ্ডকে তরুণরা শাস্তি দিতে প্রস্তুত। তাদের বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। দেশদ্রোহীদের রক্তপান করতে নাগশিশুরা সর্বদা

তৃষ্ণিত হয়ে আছে। *বিষবাণী* প্রবন্ধে নজরুল এভাবেই তাঁর বিষয় বৈচিত্র্যের নির্যাসকে ব্যক্ত করেছেন।

ক্ষুদিরামের মা প্রবন্ধটির মধ্যদিয়ে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত ভারতীয় মায়েদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। অনন্য দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের সূত্র ধরে প্রাবন্ধিক ভারতবর্ষের যুবসম্প্রদায়কে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গী হতে বলেছেন। ভারতবর্ষকে নজরুল ইসলাম দেখতে পেয়েছিলেন কসাইখানা হিসেবে। বিষয়টিকে তিনি বিক্ষুব্ধভাবে দেখেছিলেন। তাই বিদ্রোহ করেছেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। *আনন্দময়ীর আগমনে* কবিতাটি লেখার জন্য প্রাবন্ধিকের এক বছর জেল হয়েছিল।[১৮] কিন্তু কবিকে জেলে রাখা যায় নি। জেলের তালাকে তিনি লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলার আহ্বান জানিয়েছেন। কবির আহ্বানে ব্রিটিশ দুঃশাসনকে পিছনে ফেলে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন ক্ষুদিরাম তাদেরই অগ্রজ ও পথ-প্রদর্শক। *রুদ্রমঙ্গল গ্রন্থের ক্ষুদিরামের মা* প্রবন্ধে দেশপ্রেমিক মায়েদেরকে উজ্জীবিত করার প্রকৃত আবেদনই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ক্ষুদিরামের অনন্য দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের সূত্র ধরে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে আত্মোৎসর্গে উজ্জীবিত হতে বলেছেন। পরাধীন ভারতমাতা বা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার আহ্বানই জানানো হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে।

প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় ক্ষুদিরাম পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় সে স্বাধীনতাকামী এক বিপ্লবীর সাথে যোগ দেন। ব্রিটিশ তোষণের পক্ষের লোক ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ড সাহেবকে হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি মুজফ্ফরপুর গ্রামে যান। সেখানে ভুলবশত কিংস ফোর্ডের গাড়ির পরিবর্তে অন্য এক সরকারি কর্মচারির গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন। গাড়িতে বোমা নিক্ষেপের পরে গাড়িতে অবস্থানকারী রাজকর্মচারী ও তার মেয়ের মৃত্যু হয়। গাড়িতে বোমা নিক্ষেপের অপরাধে শাস্তি স্বরূপ ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দেয়া হয়। আঠারো বছরের ক্ষুদিরাম দেশের শৃঙ্খল-মুক্তি ও বন্ধন মুক্তির জন্যই গাড়িতে বোমা মেরেছিলো। দেশের শৃঙ্খল মুক্তির জন্য যারা নির্ভয়ে জীবন দিতে চান, যারা ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে মৃত্যুকে সাদরে বরণ করে নিতে চান, ক্ষুদিরাম ছিলেন তাদেরই একজন পথ প্রদর্শক প্রতিনিধি। স্বাধীনতাকামী ও মুক্তকামী দেশমাতৃকার কবি নজরুল ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। ভারত সন্তানরাই পারবে পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে ভারত মাতাকে মুক্ত করতে। আত্মবলিদানই হলো পরাধীন ভারতের একমাত্র মুক্তির পথ। মাতৃহারা ক্ষুদিরামের কাছে দেশই তার মা। 'ক্ষুদিরাম ছেলেবেলায় মা হারিয়ে— পেয়েছিল সারা দেশের মায়েদের।'[১৯] সেই পরাধীন মাতৃভূমির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে দেশপ্রেমিক নজরুল *ক্ষুদিরামের মা* প্রবন্ধে দেশের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার জন্য অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। কোনো রকম বাধা-বিপত্তির কথা না ভেবেই প্রাবন্ধিক অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বাল্যকালে ক্ষুদিরাম তার মাকে হারিয়েছে। মাকে হারানোর কারণে ভারতের সব মাকে সে নিজের মা হিসেবে জেনেছে। এরপরেও তার তৃপ্তি আসে নি। সে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবার সামনে অঙ্গীকার হিসেবে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন যে, সে আবার মৃত্যুর পর ফিরে আসবে। তবে ফিরে আসার জন্য ক্ষুদিরাম তার মায়ের ঘরে জন্ম না নিয়ে সে তার মাসির ঘরে তখন জন্মগ্রহণ করবে।[২০] মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ক্ষুদিরাম আত্মবলিদানের মধ্যদিয়ে এক ধরনের প্রতিশোধ নিতে চান। যা বেদনাদীর্ণ প্রতিবাদ। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি অবস্থানে তার চোখে নেই কোনো অশ্রুর ফোয়ারা, বা দুঃখ-কষ্টের আবেশ। জীবনের সব ব্যথা যেন সে ইতোমধ্যেই হজম করে ফেলেছে। তার জীবনের দুঃখ-কষ্টের সব যন্ত্রণা যেন ঠোঁটের নিচে লুকিয়ে রেখে ভারত মাতাদের মিষ্টি হাসি দেখতে পান। আত্মত্যাগী ক্ষুদিরাম মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জীবন বলি দিয়ে ভারতীয় মায়েদের সুখ কেড়ে নিয়ে তাদের মনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তাই তাঁরা আপন সন্তানদের বুকে রেখেও শান্তি পান না। আত্মবিসর্জিত ক্ষুদিরাম তাই মা-ছেলের মাঝখানে কাঁটার মতো বিদ্ধ হয়ে আছেন। কারণ ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলেছিল ১৮ মাস পর সে আবার আসবে। তাই ভারতীয় মায়েদের অন্তর্দৃষ্টিকে ক্ষুদিরাম নাড়া দিতে পেরেছে। প্রাবন্ধিক নজরুল দেশের জননীদের জানিয়েছেন যে, শহীদদের আত্মোৎসর্গ কোনো দিনই বৃথা যায় না। দেশমাতা ভারত আজ পরাধীন, তাই মায়ের কোলে আগত সন্তানরা ঘুমিয়ে থাকতে পারেন না। রক্তে তাদের এক ধরনের শক্তি খেলা করছে। আর সে খেলার অন্যতম কারণ হলো ভারত মাতাকে মুক্ত করা। ক্ষুদিরামের মতো ভারতীয় মায়েদের কোলে যে সব ক্ষুদিরামের জন্ম হয়েছিল তারা আত্মবলিদানের মাধ্যমে পরাধীন ভারত মাতাকে রক্ষা করবে। তাই তাঁদেরকে মাতৃস্নেহে কখনো বেঁধে রাখা যাবে না। ক্ষুদিরাম আজ নেই, কিন্তু বাংলার ঘরে ঘরে জন্ম নিয়েছে কোটি কোটি ক্ষুদিরাম।

ভারতবর্ষের মায়েরা কিছুতেই বুঝতে চান না যে, তাদের কোল জুড়ে আজ জন্ম হয়েছে হাজার হাজার ক্ষুদিরাম। আর এই ক্ষুদিরামদের জন্ম হয়েছে আত্ম বলিদানের জন্যই। দেশ প্রেমিক প্রাবন্ধিক নজরুল ভারতীয় মাদের চোখের পানি মুছে ফেলে দিয়ে ক্ষুদিরামদেরকে কোলচ্যুত করার আহ্বান জানিয়েছেন। 'ক্ষুদিরাম গেছে কিন্তু সে ঘরে জন্ম নিয়ে এসেছে কোটি কোটি ক্ষুদিরাম হয়ে।'[২১] নজরুলের মতে ভারত মাতার সন্তানরা কেবল মায়ের একার নয়। তারা ভারত মাতার সন্তান, তারা দেশ মাতৃকায় ক্ষুদিরামের নব আত্মা। তাদের জন্মই হয়েছে মুক্তিপণে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জয়গান গাওয়ার জন্য। মায়েরা যেন অনুরূপ ক্ষুদিরামকে সাহস জোগায়। তাঁরা যেন শক্তির আঁচলে ক্ষুদিরামদের ঢেকে রাখতে না চান। ভারতীয় মাদের বুঝতে হবে যে, তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট মায়ের নিজস্ব সম্পদ নন। তাঁরা পরাধীন দেশমাতাকে রক্ষার জন্যই বলিদানের জন্য প্রস্তুত নিবেদিত প্রাণ। তাই প্রাবন্ধিক ভারত মাতাদের মুক্তিকামী দেশ মাতৃকার আহ্বানে জাগ্রত হতে বলেছেন। ভারতীয় জননীদের সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের সম্যক ধারণা থাকার কারণে প্রাবন্ধিক নজরুল এক ধরনের আহ্বান জানিয়েছেন। যে আহ্বানের তাৎপর্য হলো পরাধীন ভারতীয়দের শৃঙ্খল ছিন্ন করে নতুন সূর্যের উদয় ঘটানো। ক্ষুদিরাম যেন মায়ের কোল থেকে মুক্ত হয়ে মাতৃস্নেহের মায়া

কাটিয়ে উঠে, সেইসাথে ফাঁসির মঞ্চে এসে দাঁড়ান। যে উদ্দেশ্যে তাদের জন্ম হয়েছে সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করতে হবে। তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে তাঁরা বিশেষ কোনো মায়ের সন্তান নন, তাঁরা দেশ মাতৃকার সন্তান। সে কারণেই তাঁদের ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে। আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। তাঁদের আত্মদানই মুক্তি দানের শেষ উপায়।

প্রাবন্ধিক নজরুল ইসলাম *ধূমকেতুর পথ* প্রবন্ধের মাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে বলেছেন— 'ধূমকেতু ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।'[২২] ভারতবর্ষ কারো অধীনে থাকতে চায় না। ভারবর্ষের শাসনভার, স্বাধীনতা ও দায়দায়িত্ব থাকবে কেবল ভারতীয়দের হাতে। যে বিদেশীরা ভারত পরিচালনার নাম করে ভারতবর্ষকে শোষণ করে এবং শোষণ করে ভারতবর্ষকে শ্মশানে পরিণত করতে চায়। এমন কি ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পোটলা বেঁধে সাগরে ফেলে দিতে চায়, তাঁদের প্রতি তিনি অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন— 'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায় এই *ধূমকেতু*।' আর এই স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চাইলে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিদেশীদের চাপিয়ে দেয়া নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। আর এ বিদ্রোহ করতে হলে অবশ্যই নিজেই নিজেকে প্রথম চিনতে হবে। যে নিজেকে চিনতে পারে না, সে নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। অর্থাৎ অন্য কারো কাছে সে মাথা নত করে না। তাই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীন হবার জন্য নিজেকে চেনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে নজরুল গবেষক আজহারউদ্দীন বলেন— 'ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে ধূমকেতু কাগজ বের করেন— অগ্নিগর্ভ লেখনী থেকে বজ্রবিষাণ বেজে উঠল।'[২৩] নিজেকে চেনা অর্থ সত্যকে জানা ও চেনা। সত্যটিকে চেনা ও জানার জন্য জাগ্রত হতে হয়, আর সত্যকে জাগানোর প্রয়োজন হলো বিদ্রোহের। *ধূমকেতুর পথ* প্রবন্ধে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাই সেকথাগুলো সত্য ভাষ্যে উচ্চারিত হয়েছে। ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত মুক্তবুদ্ধির ধারক নজরুল কোনো ধর্মকেই ছোট করে দেখেন নি। তিনি তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির অজ্ঞতা দূর করার জন্য লেখনি ধারণ করেছেন। ধর্মীয় অজ্ঞতা দূর করে ধর্মান্ধ মানুষকে আলোর রাজ্যে পৌঁছে দেবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আলোচ্য প্রবন্ধটির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, প্রতিটি ধর্মই মানব কল্যাণের বার্তা বয়ে এনেছে। মানব জীবনকে সুন্দর করার পথ দেখিয়ে দিয়েছে। মানুষ তার ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করার জন্য অহংকার, দাপট, ক্ষমতা ও লোভের কারণে ধর্মকে বিকৃত পথে ব্যবহার করে থাকেন। যখন কোনো কিছুতে পেরে না উঠেন, তখন মানুষ ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার্থে ধর্মকে কাজে লাগিয়ে থাকে। এ জন্য ধর্মকে কখনোই দায়ী করা যায় না।

মানুষের প্রতি ভালোবাসাই হলো ধর্মের মূলকথা। আর নজরুল এ বিশ্বাসটি পোষণ করতেন। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিরসন কল্পে উদার মানবিকতা সম্পন্ন মনুষ্যত্বের জাগরণই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদহীন স্বদেশই তাঁর কামনা। তাঁর এই কামনার প্রকাশ ঘটেছে *হিন্দু-মুসলমান* নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে। ভারতবর্ষে সে সময়ে চলছিল উত্থান-পতনের পর্ব। তখন হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদে ছিল দ্বিধাহীন। এমন সময়ে (ব্রিটিশ শক্তি) ঔপনিবেশবাদী শক্তি ভারত শাসন

আইন পাস করে কলাকৌশল নির্ধারণ করে। দেশে তখন হত্যা, দমন, পীড়ন চরমহারে বেড়েছিল। এমন পরিস্থিতি থেকে উভয় জাতিকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতার কবি নজরুল জাগ্রত হয়ে লেখনি ধারণ করেছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকে একই সূত্রে গেঁথে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি বলেছেন— 'অবতার পয়গম্বর কেউ বলেন নি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি— আলোর মত, সকলের জন্য।'[২৪] সে সময়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে দেশ আজ ধ্বংসের পথে পরিচালিত হয়ে চলছে। হিন্দু-মুসলমানের সংঘাত নজরুলকে বেদনায় কাতর করে তুলেছিল। মানুষকে তিনি ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে স্থান দিয়ে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয়েছিল— 'জাতের চাইতে মানুষ সত্য' নামক অসাম্প্রদায়িক আহ্বানটি। মানুষের জন্যই ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাই সব ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা মানুষ অনেক বড় ও মহীয়ান। সে কারণেই তিনি বলেছিলেন— 'এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নেই।'

১৯২৬ সালের ২ এপ্রিল কলকাতায় এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘঠিত হয়। এরই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে নজরুল *মন্দির ও মসজিদ* প্রবন্ধটি লিখেছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মের জন্য শুধু লোক দেখানো মসজিদ-মন্দির তৈরি করা মানবতাবাদী নজরুলের কাছে অর্থহীন। জীব-প্রেম তখন তাঁর কাছে বড় হিসেবে দেখা দেয়। ধর্মের নামে মসজিদ-মন্দিরকে পুঁজি করে অনাচার, অসদাচার ও মানুষ হত্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানুষকে পশুত্বে পরিণত করেছিল। ধর্মের নামে যাঁরা স্বার্থসিদ্ধি করে নজরুল তাদেরকে চরম ঘৃণা করেছেন। ধর্মান্ধ মুসলমান ও হিন্দু যখন আল্লাহ ও কালীর নামে পরস্পর পরস্পরের মাথা ফাটিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আর্তনাদ করে তাদেরকে তিনি ঘৃণা করেছেন। এ বিষয়ে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য- 'মারো শালা যবনদের! মারো শালা কাফেরদের! আবার হিন্দু-মুসলমানি কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম— তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরাণীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে,— বাবা গো, মা গো,! মাতৃ-পরিত্যক্ত দুটি ভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে!'[২৫] কারণ, এদের আর্তনাদে মসজিদ টলে না, আবার দেবতার সাড়া মিলে না। তখন মানুষের রক্তে মসজিদ-মন্দির হয় কলঙ্কিত। এমন অকাজে যারা লিপ্ত তাদেরকে নজরুল বলেছেন ধর্ম মাতাল। এরা দেখেন নি যেমন সত্যের আলো, তেমনি দেখেন নি শাস্ত্রের মানবকল্যাণমূলক জয়গান। কোথাও বহুসংখ্যক হিন্দু মিলে একজন মুসলমানকে আবার কোথাও বহুসংখ্যক মুসলমান মিলে এক দুর্বল হিন্দুকে মারছে। অর্থাৎ পশুদের হাতে মার খাচ্ছে দুর্বল অসহায় মানুষ। এই পশুরা শয়তানের চেয়ে বীভৎস এবং শুকরের চেয়ে কুৎসিত। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য নজরুল ইসলাম এক অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের আবেদন প্রকাশ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুতে।

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও ত্রাসনে যখন ভারতবর্ষ প্রকম্পিত তখন ভারত শাসন আইন পাস করে এক ধরণের কলা-কৌশল নির্ধারণ করা হয়। দমন, পীড়ন ও নির্যাতন; দেশে তখন মহামারী আকার ধারণ করেছে। এমন সময়ে দেশের মানুষ ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নজরুল হিন্দু-মুসলমানকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তখন উভয় জাতিকে একত্রিত করে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। দেশে তখন 'দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়,— তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ— স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি!'[২৬] কারণ হিন্দু-মুসলমানের বুদ্ধিহীন কৃতকর্ম দেশকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করছে। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তিনি মানুষকে ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে স্থান দিয়েছেন। সেইসাথে জয়গান ঘোষণা করেছেন মানবতার। তিনি ধর্ম অপেক্ষা মানুষকে অনেক বড় ও মহীয়ানভাবে উপস্থাপন করে তাঁর স্বতন্ত্র বাক্যে প্রকাশ করেছেন। এভাবে তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে এক অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাবন্ধিক নজরুল ইসলাম মনে করেন হিন্দু-মুসলমানের যে সংঘাত তার নাম পশুত্ব। তিনি প্রবন্ধে পশুত্বকে লোম ও লেজ বিহীন প্রাণী হিসেবে তুলনা করেছেন। 'যেসব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে— শৃঙ্গরূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেইসব পশুদের দেখে— যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয়নি! শিংওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃঙ্গহীন ব্যাঘ্র ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র— বেশি ভীষণ।'[২৭] লেজ এবং শিং আছে এমন পশুগুলোকে তিনি কম হিংস্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবার এক শ্রেণির প্রাণী আছে যাদের শিং নেই, কেবল লেজ আছে সেগুলো অধিকতর হিংস্র। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান মূলত ঐ রকম লেজওয়ালা পশু হিসেবে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির লেজ নেই, কিন্তু তাদের চিন্তা-ভাবনা, কর্মপরিকল্পনা পশুর মতো। তাই আজ তারা ভারতবর্ষে টিকি ও দাড়ি রেখে পশুত্ব অর্জন করছেন। এই দুটি অর্জন আজ গোটা ভারতবর্ষকে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অবতীর্ণ করেছে। আল্লাহ বা নারায়ণ মূলত হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। তার টিকিও নেই দাড়িও নেই। টিকি-দাড়ি মানুষকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় যে তুমি আলাদা, আমি আলাদা। নজরুল এসব থেকে বের হয়ে এসে উভয় জাতিকে একই মোহনায় মিলিত হয়ে মানবতার জয়গান গাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ধরাধামের এই পৃথিবীতে যত পীর-পয়গম্বর ও অবতার এসেছেন তাঁরা সবাই এসেছিলেন মূলত মানুষের কল্যাণের জন্য। তাঁরা কখনো বলেন নি আমি কেবল হিন্দু বা মুসলমানের জন্য এসেছি। আলোর মতো তাঁরা সবার জন্য, অথচ পয়গম্বর ও অবতারদের সীমিত করেছে টিকিওয়ালা ও দাড়িওয়ালারা। কৃষ্ণের ভক্তেরা কৃষ্ণকে তাদের নিজের, মোহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীরা মোহাম্মদ (সা.)কে নিজের এবং খ্রিস্টের ভক্তরা খ্রিস্টকে নিজ নিজ সম্পত্তি মনে করেন।[২৮] এমন কৃতকর্মকে নজরুল বিপত্তি হিসেবে দেখেছেন। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া চলে না। কারণ আলো নিয়ে ঝগড়া করলে নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়। ছেলে বেলায় চাঁদ-সূর্যকে সবাই নিজের পাড়ার সম্পত্তি হিসেবে জানতেন, কিন্তু চাঁদ-সূর্য কোনো বস্তুগত সম্পত্তি নয় সেটি বড় হয়েই ছেলে-মেয়েরা বুঝতে পারে। তেমনি স্রষ্টাও বস্তুগত

কোনো সম্পত্তি নয়। তাই এ নিয়ে বা এর মালিকানা নিয়ে প্রাবন্ধিক দ্বন্দ্ব না করার আহ্বান জানিয়েছেন। ১৯২৬ খ্রি. কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিনবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল।[২৯] তাই প্রাবন্ধিক নজরুল ইসলাম *মন্দির ও মসজিদ* এবং *হিন্দু-মুসলমান* প্রবন্ধে ধর্ম নিয়ে মতান্তর বা বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি উভয় জাতিকে এসব বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয়কে লালন করতে বলেছেন। প্রাবন্ধিকের কাছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই শ্রদ্ধার ও সম্মানের অধিকারী। তাই তিনি মন্দির ও মসজিদ এবং হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে ধর্ম নিয়ে ভেদ বুদ্ধিহীন বিড়ম্বনা থেকে বের হয়ে আসার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। এখানেই নজরুল ইসলাম এক অসাম্প্রদায়িক মানুষ।

প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর *রুদ্র-মঙ্গল* গ্রন্থের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশের সমকালীন সমাজব্যবস্থা, জীবন বাস্তবতা, সমকালীন সংস্কৃতি এবং শাসন-তোষণের প্রকৃত পরিচয়কে আবেগহীনভাবে বলবার প্রয়াস চালিয়েছেন। 'যে বেদনা রুশোকে বিদ্রোহী করেছে, শেলীকে করেছে ঘরছাড়া, যে আদর্শের প্রেরণায় টমাস পেইন হয়েছেন দেশত্যাগী, যে যন্ত্রণায় বিদ্রোহীরা মাথা খুঁড়েছেন ব্যাস্টিলের কারাকক্ষে, সাইবেরিয়ার ঊষর প্রান্তরে, সেই প্রেরণায় নজরুল বিদ্রোহী।'[৩০] তিনি চরম সত্যকথাকে তাঁর রচিত *রুদ্র-মঙ্গল* নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যদিয়ে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করে গ্রন্থে বর্ণিত প্রবন্ধসমূহের বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন সমকাল দ্রষ্টা প্রবন্ধকার হিসেবে যা দেখেছেন কেবল সেটুকু সত্য ভাষ্যে তাঁর এই গ্রন্থে বিষয়-বৈচিত্র্যতার মধ্যদিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

<u>তথ্যসূচি:</u>

১. আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*-আধুনিক যুগ (ঢাকা: অনন্যা-৩য় সংস্করণ-২০০১), পৃ. ৪১০
২. ড. রথীন্দ্রনাথ রায়, *বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী* (ঢাকা: নবনী প্রকাশনী, তয় সংস্করণ-২০০৭), পৃ. ১
৩ ড. অধীর দে, *আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা-২য় খণ্ড* (কলকাতা: উজ্জ্বল বুক স্টোরস-১৯৯১), পৃ. ৪২
৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *আমার পথ* (ঢাকা: সাহিত্য পাঠ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা-২০১৪), পৃ. ৮০
৫. *তদেব*, পৃ. ৮০
৬. *তদেব*, পৃ. ৭৯
৭. *তদেব*, পৃ. ৮০
৮. *তদেব*, পৃ. ৮০
৯. আতাউর রহমান, *নজরুল কাব্য সমীক্ষা* (ঢাকা: মুক্তধারা, ৪র্থ প্রকাশ-১৯৮৭), পৃ. ১২৪
১০. রফিকুল ইসলাম-সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, নতুন সংস্করণ-১৯৯৬), পৃ. ৪২২
১১. *তদেব*, পৃ. ৪২৩
১২. বিশ্বজিৎ ঘোষ-সম্পাদিত, *বিষাদসিন্ধু*, (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পুনর্মুদ্রণ-২০০৯), পৃ. ২৮৫
১৩. রফিকুল ইসলাম-সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩

[১৪.] করুণাময় গোস্বামী,*বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম* (ঢাকা:বাংলা একাডেমি-১৯৯০), পৃ. ২৩৯

[১৫.] রফিকুল ইসলাম-সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৪

[১৬.] *তদেব*, পৃ. ৪২৫

[১৭.] *তদেব*, পৃ. ৪২৫

[১৮.] আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল* (কলকাতা: সুপ্রিম পাবলিশার্স-১৯৯৭), পৃ.৩৬৯

[১৯.] রফিকুল ইসলাম-সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬

[২০.] *তদেব*, পৃ. ৪২৬

[২১.] *তদেব*, পৃ. ৪২৭

[২২.] *তদেব*, পৃ. ৪২৮

[২৩.] আজহারউদ্দীন খান, *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

[২৪.] রফিকুল ইসলাম-সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭

[২৫.] *তদেব*, পৃ. ৪৩১-৪৩২

[২৬.] *তদেব*, পৃ. ৪৩৫

[২৭.] *তদেব*, পৃ. ৪৩৬

[২৮.] *তদেব*, পৃ. ৪৩৭

[২৯.] শ্রীমধুসূদন বসু, *নজরুল কাব্য পরিচয়* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি-৪র্থ সংস্করণ-১৯৯৯), পৃ. ২৯৮

[৩০.] আতাউর রহমান, *নজরুল কাব্য সমীক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫